একুশে ফেব্রুয়ারী

- ভাষাসৈনিক ইঞ্জিনিয়ার মুহম্মদ রকিব-উদ-দৌলা

‘একুশে ফেব্রুয়ারী' এ কথাটা দুটা শব্দের

সমন্বয়ে গঠিত- যার একটি বাংলা শব্দ সংখ্যা একুশ কে নিয়ে এবং আরেকটি একটি ইংরেজী মাসের নাম। আলাদা ভাবে শব্দ দুটির তেমনকোন বিশেষত্ব নেই থাকার কথাও নয়। অতি সাধারণ দুটি শব্দ। কিন্তু একত্রে যখন ‘একুশে ফেব্রুয়ারী’ রুপে উচ্চারিত হয় তখন

এর বিশেষত্ব অনেক ও সুদূর প্রসারী। একুশে ফেব্রুয়ারী আজ আর বাংলাদেশের কারো কাছে অজানা নয়। একুশে ফেব্রুয়ারী একটি শোকগাঁথা। গত প্রায় ৫০ বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষ একুশে ফেব্রুয়ারী এলেই হয়ে উঠে শোকাপ্লুত এবং একতাবদ্ধ। গেয়ে উঠে একুশের গান। নগ্নপদে সারি বেঁধে চলে

যায় আজিমপুর কবরস্থানে ফুল হাতে নিয়ে। গোরস্থান প্রদক্ষিণ শেষে জমা হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজের গেটের কাছে অতন্দ্র প্রহরীর মতো দন্ডায়মান ‘শহীদ মিনার' এ। সেখানে তারা ঢেলে দেয় ফুলের মালা ও ফুলের তোড়া। ওই ফুলের মাধ্যমে জানায় তাদের প্রানের ভালবাসা, হৃদয় নিংড়ানো স্নেহ, মমতা ও অন্তরে সযত্নে লালিত ও পালিত মনের আকুতি মিনতি ও হাহাকার। দুটো শব্দ তাই একত্রিত হয়ে আর বাংলাতেও থাকেনা ইংরেজীতেও থাকেনা হয়ে যায় একটি নতুন কথা যা প্রানে জাগায় অত্যন্ত বেদনা মাখা মমতার এক শিহরণ। সেই একুশে ফেব্রুয়ারী আমি দেখেছিলাম। সেই কথাই আজ বলবো। তার আগে এর পটভূমিকা একটু দেখা যাক ।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান-ভারত এই উপমহাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস যে নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন, তা অনেকেই জানেন। সে সময় বৃটিশরাজের উচ্চপদস্থ ইংরেজ শাসকবৃন্দই বলতেন “What Bengal thinks today, the rest of India thinks it tomorrow”. কথিত আছে সেই দেশবন্ধুর দুইজন ভাবশিষ্য ছিলেন। প্রথম জন হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আর দ্বিতীয় জন হলেন

হোসেন শহীদ সোহরোওয়ার্দি। কিন্তু নেতাজীর সাথে দ্বন্ধ শুরু হলো গান্ধিজীর ফলে ভারত ত্যাগ করে বিভিন্ন দেশের দ্বারস্থ হতে গিয়ে দূর্ঘটনায় প্রাণ দিলেন তিনি। ওদিকে সোহরোওয়ার্দির সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিলো জিন্নাহর। সোহরোওয়ার্দি মৃত্যুবরণ করেন বিদেশের এক হোটেলে। ১৯৪৭ এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশের প্রায় দেওলিয়া অবস্থা। ভারতবর্ষের উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত আন্দোলনে নেতাদের রাজনৈতিক দিক নির্দেশনায় বৃটিশকে ভারত ত্যাগে বাধ্য করা হলো। ফলে ‘পাকিস্তান' নামক নতুন একটি রাষ্ট্রের জন্ম হলো। আমরা পেলাম পূর্বপাকিস্তান-রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি মাত্র প্রদেশ। পশ্চিম পাকিস্তানে হলো ৪টি প্রদেশ সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ। পাকিস্তানের আয়ের বিভিন্ন উৎস থেকে আহরিত অর্থ ভাগ হলো পাঁচ ভাগে। আমরা পেলাম তাই বাজেটের এক পঞ্চমাংশ মাত্র। আমাদের সোনালী আঁশ পাট, আমাদের কাগজ, আমাদের চা, প্রভৃতি থেকে যে লাভ হতো তার সিংহভাগ চলে যেত পশ্চিম পাকিস্তানে। কারণ পাকিস্তানের হর্তাকর্তারা প্রায় সবাই ছিল পশ্চিম

পাকিস্তানের। অথচ আমরাই ছিলাম পাকিস্তানের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী, আর আমরাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় ছিলাম সবার আগে। আমার মনে আছে তখন স্কুলের উচ্চ শ্রেনীর ছাত্র ছিলাম।

তখন পাকিস্তান নামটাই অনেকের জানা

ছিলনা। তাই 'পাকিস্তান' নামকে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য আমরা পাকিস্তান স্পোর্টিং ক্লাব', 'পাকিস্তান ফুটবল টিম' প্রভৃতি নামে গাইবান্ধার (রংপুর জেলা) ভরতখালীতে খেলাধুলার

সেকি জমজমাট ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলাম।আমিই ছিলাম সেসবের পুরোভাগে। আমাদের মন কেন বিষিয়ে উঠবে না ? আমাদেরই সোনালী আশের সোনায় সোনা হয়ে উঠলপশ্চিম পাকিস্তান, আর পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ

অর্থাভাবে হয়ে রইল দিশেহারা। তার উপর শুরুতেই হলো রাষ্ট্রভাষা নিয়ে শাসকগোষ্ঠির ছেলেখেলা। তাদের মধ্যে দেখা দিল রাজনৈতিক দুরদর্শিতা ও পরিপক্কতার অভাবনীয় অভাব। অতি সাধারণ একটি সমস্যার সমাধান দিতে তারা শুধু ভুলই করলেন না, দুষমনের মত অপরিনামদর্শী আচরণ করলেন । স্বয়ং জিন্নাহ সাহেব আগপিছ না ভেবে একজন ডিক্টেটরের মত নিজেকে প্রকাশ করে হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন - "Urdu and Urdu only shall be the state language of Pakistan" আমরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা (আমি ইতিমধ্যে ঢা.বি. এর ছাত্র) সেদিন সমবেত হয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতা শোনার জন্য। আমরাও তার হুংকারের উত্তরে সমবেতভাবে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলাম এবং উচ্চস্বরে বারবার ধ্বনি দিয়ে উঠলাম Shame ! Shame ! Shame!".

সভা জমলোনা। জিন্নাহ সাহেব ক্রুদ্ধ হয়ে

বিদায় নিলেন। কিন্তু অন্তরালে ষড়যন্ত্র থামলো না। কি করে চিরদিনের জন্য পূবের মানুষকে পশ্চিমের মানুষের সেবাদাসে পরিণত করা যায়, নিপুণভাবে চলতে থাকলো তার ষড়যন্ত্র। আমরাও থেমে থাকলাম না। আন্দোলন শুরু হলো। আমি তখন সলিমুল্লাহ হলে থাকতাম।

ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েছিলাম কিছুটা। আমাদের দলীয় নেতা ছিলেন তখন অলি আহাদ (বর্তমান ডেমোক্রাট লীগের কর্নধার)। "Progressive Democrat" নাম দিয়ে আমরা দল বাঁধলাম। সেই দলের হয়ে হল ইউনিয়নের নির্বাচনে দাঁড়ালাম (তখন

Provost ছিলেন ড: এম্, ও গণি, পরবর্তীতে উপাচার্য) এবং ক্যাবিনেট সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হলাম। তখন এদেরকে বলা হতো ক্যাবিনেট মন্ত্রী। আমাদের দল থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট

নির্বাচিত হলেন মুস্তফা নূরুল ইসলাম(এখন ডঃ এবং সম্ভবত জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে)। সে সময় আমাদের সাথে ছিলেন এ ডব্লিউ সামসুল আলম (পরে রুমানিয়ার রাষ্ট্রদূত), কাজী আব্দুল আলীম (বাংলাদেশের খেলাধুলার জগতের একজন অগ্রদূত), গাজীউল হক

(বর্তমানে এডভোকেট এবং কিছুদিন আগে সিডনী এসেছিলেন), অধ্যাপক আবুল কাশেম (বাংলা কলেজের), অধ্যাপক নূরূল হক ভূঁইয়া, ডাঃ জামাল (যার নামে দামাল সামার ক্রিকেট গড়ে উঠে বাংলাদেশে), ইশতিয়াক আহমেদ(ব্যারিস্টার), ডাঃ আবুল হোসেন (পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য) এবং আরো অনেকে। যাইহোক, তারপর ৫২ সালে পূর্ব-পাকিস্তান এসেম্বলীর অধিবেশন শুরু হতে চলল যখন তখন জানা গেলো এই অধিবেশনেই পূর্ব-পাকিস্তান বাসীদের মতামত চূড়ান্ত করবেন সেদিনের রাজনীতিবিদগন। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী সহ অনেক মন্ত্রী, পার্টিনেতা প্রভৃতি করাচী গেছেন,এসেছেন; জিন্নাহ সাহেব এসেছেন এবং গেছেন কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। তমদ্দুন মজলিস সহ ছাত্ররা আন্দোলন

চালিয়েই যাচ্ছিল। তাই আমরা জগন্নাথ হলের এই অধিবেশনে স্পীকার ও তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রতিবাদী স্মারকলিপি দেয়ার জন্য ও সমস্ত মেম্বারদের অনুরোধ করে তাঁদেরই ছেলেমেয়েদের দাবীর সুবিবেচনার জন্য সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলাম। কি দাবী ?

Bengali and Bengali only shall be

the state language of Pakistan ?

না; সে দাবী নয়। যদিও গণতান্ত্রিক রীতি

অনুযায়ী সেই দাবী আমরা করতেই পারতাম। কিন্তু আমরা তা করিনি। উর্দুর সাথে সাথে আমরা শুধু বাংলাকেও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বানানোর দাবী জানিয়েছিলাম মাত্র। এটা কি কোন অন্যায় দাবী ছিল? একটি রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠির মায়ের ভাষাকে

স্তব্ধ না করার আবেদন। একটা দেশের

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার। এই সামান্য দাবীই ছিল আমাদের। কিন্তু পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠি কি করলেন সেদিন ?

সেদিন একুশে ফেব্রুয়ারী। সকাল থেকেই যেন ঢাকার আকাশ বাতাস স্তব্ধ মনে হয়েছিল আমার কাছে। কারণ জানা গেলো যে, সরকার জগন্নাথ হলের আশেপাশে সমস্ত এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে। আমাদেরকে তারা এসেম্বলী হলে দেখা করতেও দেবে না,

মিছিলও করতে দেবে না। এমনকি একত্র

হতেও দেবে না। আমার বন্ধু ও ছোট ভাইয়ের মত মন্টু বা জোহা(ডঃ জোহা) এবং হামিদ(পরবর্তীতে ডঃ আব্দুল হামিদ, আমেরিকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত) আমরা ঠিক করলাম যে হল থেকে বেড়িয়ে প্রভোষ্টের বাসার পাশ দিয়ে ঘুরে জিমনেসিয়ামে পৌঁছে একত্রিত হবো। দুজনের বেশী একত্রে যাওয়া নিষেধ।

জোহা সাইকেলে যাবে, আমি আর হামিদ হেটে যাব। একটু সকালেই প্রায় আটটার দিকে বের হলাম। জিমনেসিয়ামে পৌঁছে জোহাকে পেলাম। সে ইতিমধ্যে কার্জন হল ও আর্টস বিল্ডিং এলাকা ঘুরে এসেছে। জোহা বলল, "রকীব ভাই, চারিদিক থেকে লোকজন আসছে, মিছিল বেশ বড় হবে মনে হয়। আমাকে ও

আপনাকে মিছিলের ডিসিপ্লিন রক্ষার ভার দিয়েছে।“ আমি বললাম, "কোন অসুবিধা নেই। তোমার একটা সাইকেলেই দুজনেরই হবে"। দেখতে দেখতে জিমনেসিয়াম মাঠ প্রায় ভরে গেলো। সেখান থেকে মিছিল বের করে কার্জন হলের পাশ দিয়ে ফুলার রোড ধরে হর্ণ

নিয়ে আমরা শ্লোগান দিতে দিতে একমাথা

থেকে অন্য মাথায় চলতে থাকলাম। আমাদের শ্লোগান ছিল, 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই বাংলা ভাষা মায়ের ভাষা বাংলা ভাষা দিতে হবে, দিতে হবে' ইত্যাদি। এক পর্যায়ে আমাদের মিছিল যোগ দিল প্রধান মিছিলের সাথে, যা কিনা শুরু হয়েছিল আর্টস্ বিল্ডিং থেকে। আমি সাইকেলে একবার এ মাথা থেকে ও মাথা আবার জোহা এ মাথা থেকে ও মাথা; এভাবেই

হর্ণ এ শ্লোগান দিয়ে চলছিলাম। তারপর

একসময় মিছিলটা কিছুটা থেমে গেলো, তখন সকাল দশটা কি সাড়ে দশটা। জোহা সাইকেল নিয়ে ও মাথায় অর্থাৎ মেডিক্যালের দিকে। হঠাৎ কিছু বুঝার আগেই শুনলাম গুড়ুম গুড়ুম গুলির শব্দ । কি

ব্যাপার ? গুলি যে হবে মিছিলে তা আমরা ধারনাও করিনি, কারণ ভেবেছিলাম সরকার তো আমাদেরই সরকার আমাদের নিজেদের লোকই তো সেখানে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হন্তদন্ত হয়ে জোহা লাফ দিয়ে সাইকেল থেকে নেমে চীৎকার দিয়ে ধ্বনি দিল "আল্লাহ আকবর"। বলল, রকিব ভাই, গুলিতে ক'জন পড়েছে দেখতে পেলাম না, জনতা তাদেরকে ঘিরে রেখেছে । চলুন আর এখানে নয়। বলেই ওর স্বভাবমত গালিগালাজ করতে করতে সাইকেল নিয়ে উধাও হয়ে গেল। খুঁজে দেখি হামিদও পিছু হাটা দিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রসেশন ভেঙ্গে গেলো। আমি বুঝলাম সরকার পরিবর্তন ছাড়া বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা যাবে না । এই সরকার ক্ষমতায় থাকলে তা কোনদিনই সম্ভব নয়, ওরা ওদের গদির জন্য আমাদের উপর গুলির হুকুম দিয়েছে। আমার পরবর্তি প্রতিজ্ঞা হলো সরকার পরিবর্তনের প্রতিজ্ঞা। সেদিন সারাদিন রোজা রেখে সন্ধ্যার দিকে দাফন কাফন সেরে আর ক্ষুধা পেল না। হলে গিয়ে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করলাম কি করব, কি করা যায় এখন। হতাশার চূড়ান্ত আমার মনকে ছেয়ে ফেলল। পরদিনই দেশের বাড়ীতে চলে গেলাম। সেখানে আমার একভাই

মুসলিমলীগের আঞ্চলিক শাখার ডাইস

প্রেসিডেন্ট। সবাই ঢাকার খবর জানতে

চাইলো। তাই সেখানে মুসলিম লীগ অফিসে একটা মিটিং করলাম। উপস্থিত সবাইকে সব খবর জানিয়ে আঞ্চলিক মুসলিম ছাত্রলীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী কাম সেক্রেটারীর পদ থেকে ইস্তফা দিলাম। এখানে একটা কথা বলে রাখি। বর্তমান শহীদ মিনার যেখানে অবস্থিত তার প্রায় ২০ গজ পশ্চিমে নির্মাণ করা হয়েছিল প্রথম শহীদ মিনার। মেডিকাল হোষ্টেলের ছাত্ররা শুধুমাত্র কিছু ইট, বালু, সিমেন্ট কাদা দিয়ে গড়ে তুলেছিল চিহ্ন স্বরুপ সেই ছোট্ট শহীদ মিনার। সেটা পুলিশ পরদিনই ভেঙ্গে ফেলে। তারপর

ছাত্ররা আবার মোটামুটি উচু এবং শক্ত আর একটা মিনার বানায়, কিন্তু সেটাও

কয়েকদিনের মধ্যে পুলিশ এসে ধ্বংশ করে দেয়। তারপর অনেকদিন কোন শহীদ মিনার ছিল না। যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৯৫৪ সালে (খুব সম্ভবত) বর্তমান স্থানে পূর্নাঙ্গ এই শহীদ মিনার স্থাপনের নির্দেশ দেন। ১৯৫৫ সালের দিকে বর্তমান শহীদ মিনার স্থাপন করা হয়।

১৯৫৪ সালে পাকিস্তান সরকারের State

Scholarship (Defence) উচ্চশিক্ষার (chemical engineering) জন্য লন্ডনে যাই। সেখানে আমার সহযোগী অফিসারদের মধ্যে পাঞ্জাবী একজন বার বার আমাকে উর্দুতে নানা কথা বলতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু তখন আমি উর্দু

বুঝিনা। একজন বন্ধু প্রকৃতির অফিসার তখন তাকে ইংরেজীতে বলার উপদেশ দিল। কিন্তু সে তাচ্ছিল্য করে বলল, সেতো State Language এ কথা বলছে। উর্দুতে আবার বলল, 'কিউ ম্যায়তো State Languageএ বাত কর রহাছ"। আমি খুবই অপমানিত বোধ করলাম, কিন্তু বলার কি ছিল ? সুখের কথা কয়েক মাস পরেই খবর পেলাম,

পাকিস্তান সরকার আমাদের দাবী মোতাবেক বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষনা দিয়ে আইন পাশ করেছে।আমি তখনই ঐ পাঞ্জাবী অফিসারটিকে বাংলায়

শুনিয়ে দিলাম আমিও তোমার সাথে State Language এ বাত করতেছি। সেতো অবাক, বিশ্বাসই করতে চায়না যে এটা সত্যি সম্ভব হয়েছে। আমাদের দাবী শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছে পাকিস্তান

সরকার। কিন্তু ততদিনে আমরা ৫২এর

আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে আরো অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছি।

পূর্ব-পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের মানুষ তখনভাবতে শিখেছে যে, যাদের হাত ৫২ এর ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত, তাদের আর বিশ্বাস নেই। তারা আবারো দেশের ছেলেদের উপর গুলির হুকুম দিয়ে দেশের মাটি রক্তে রঞ্জিত করতে দ্বিধাবোধ করবে না। পরবর্তী ইতিহাস সবারই জানা। আজকের আলোচ্য বিষয় তা নয়। তবে পরবর্তিতে আমি একুশ নিয়ে একটা গান লিখেছিলাম। আমার

এক বন্ধু পড়ে এত খুশী হয়েছিল যে, সেটা তার ভাইয়ের মাধ্যমে ছাপার জন্য নিয়ে যায়। কিন্তু আমি ওদিকে চলে গেলাম বিলেতে, সে গান ছাপা হয়েছিল কিনা জানতে পারিনি। কিছুদিন আগে সেই গানটা এখানকার শাপলা

পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সেই গানের একটা লাইন এরুপ:

ইঙ্গিতে যারা রেখে চলে গেলো আলোকের সন্ধান

গাহি তাহাদের জয়গান

গাহি তাহাদের জয়গান।

কারা তারা ? সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার ও নাম না জানা আরো অনেকে। তারা কি মুক্তি যোদ্ধা নয়? মুক্তির যুদ্ধে তারাইতো ছিলো সবার আগে। বরকত ও জব্বারের সাথে আমার পরিচয় ছিল। বরকত প্রথম বর্ষের আর্টসের ছাত্র ছিল, আর জব্বার ছিল বোটানীর ছাত্র। আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম অনেক অনেক

দিন আগে থেকেই। একান্ন বছর আগে

বৃটিশকে হটিয়ে দিয়ে আর সাতাশ বছর আগে পাকিস্তানের বর্বর বাহিনীকে পরাস্ত করে স্বাধীনতা পেলাম দু দু বার। কিন্তু এখনকার প্রজন্ম, এখনকার ছেলে মেয়ে যুবক যুবতীরা কি চায় ? তারা চায় “অধিকার"। এতদিন পরে উঠেছে সেই অধিকারের প্রশ্ন। কিসের অধিকার ? বাঁচার অধিকার। আর ৫২ তে আমরা কি চেয়েছিলাম? আমরা চেয়েছিলাম স্বাধীনতা নয় - 'অধিকার'। মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার, মায়ের ভাষায় লেখা পড়ার অধিকার, চিন্তা করার অধিকার, গান গাওয়ার অধিকার, স্বপ্ন দেখার অধিকার অর্থাৎ বাঁচার অধিকার। সেই অধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে চেয়েছিল তখনকার উদ্ধত রাজনীতিবিদরা। কিন্তু আমরা খুন দিয়েছি, তবু সেই অধিকারকে হস্তক্ষেপ করতে দেই নাই। তখন থেকেই তাই পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতিতে দেখা দিল আমূল পরিবর্তন। আমাদের ভায়েরা প্রান দিয়ে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়ে গেল আলোকের সন্ধান সেই আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলাম আমরা একাত্তরের চূড়ান্ত মুক্তির লক্ষ্যে আগুনের দাউ দাউ আলোকে ভাস্বর হয়ে উঠলো পরশমনির মত আমাদের সর্ব দিনের সর্বকালের আকাঙ্ক্ষিত "বাংলাদেশ" । কিন্তু সে বাঁচার অধিকার কি আজও এসেছে দেশে?

তাই বলছি একুশ মানেই মাথা নত না করা নয়, একুশ মানে নানা রং নয়, ঢং নয়, একুশ মানে অধিকার, একুশ মানে প্রত্যয়। একুশ মানে দলাদলি, কাড়াকাড়ি বা কামড়াকামড়ি নয়। একুশ মানে একতা, একতাবদ্ধতা। একুশ মানে অভিনব সব সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা বা ইতিহাস নয়। একুশ মানে নতুন প্রজন্মের জন্য সঠিক উত্তর রাখা। একুশ মানে পদক, সুবিধাবাদ, সংকীর্ণতা, বা ছিনিমিনি খেলা নয়। একুশ মানে শক্তি ও মর্যাদা ধারন করার ক্ষমতা। একুশ মানে কপটতা নয়, হঠকারিতা নয়। একুশ মানে পানির স্বচ্ছতা ও আকাশের উদারতা।একুশ মানে " বাঁচার মত বাঁচা " ।

(এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল ১৯৯৮ সালে ক্যানবেরা থেকে। এই প্রবন্ধে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মো: আলী জিন্নাহর যে বক্তৃতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা ২১শে মার্চ ১৯৪৮ সালের ঢাকার রেস কোর্সের ময়দানের বক্তৃতা নয়। এখানে ২৪শে মার্চ ১৯৪৮এ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতার কথা বলা হয়েছে। জিন্নাহ্ ভুলবশতঃ উর্দূ ভাষাকে উপমহাদেশের মুসলমানদের "lingua franca" হিসেবে চিন্তা করতেন।ছাত্রনেতা অলি আহাদ ও আরো অনেকে মো: আলী জিন্নাহকে স্মরণ করিয়ে দেন যে ওনার বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা অনেকটাই দুর্বল। জিন্নাহ্ এটাকে পাকিস্তানের শত্রুর ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করেন।মো: আলী জিন্নাহ এর পরও তৃতীয়বারের মতো ২৮শে মার্চ রেডিওতে " Urdu and Urdu only shall be the state language of Pakistan" এই কথাটি বলে ঢাকা ত্যাগ করেন। ১৯৪৮ এর ১১ই সেপ্টেম্বরে তিনি পরলোকগমন করেন।

শহীদ বরকত পেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ডাঃ দামাল ও ঢাকা মেডিকেলের কিছু ছাত্র তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। শহীদ বরকত কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই খুব সম্ভব ১-২ টার সময় মৃত্যুবরণ করেন।

যে সাইকেলের উদ্বৃতি দেয়া হয়েছে সে সাইকেলের স্পোকেও গুলী লেগেছিল। সাইকেলটিকে ফজলুল হক হলের জিমনেসিয়ামে রেখে ভাষাসৈনিক মো: রকীব উদ দৌলা সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে তাঁর ঘরে ফিরে আসেন। ডাঃ জোহা জানতেন যে দুই সপ্তাহ আগেই তার রকিব ভাইয়ের স্ত্রী হেলেন ভাবী দেশের বাড়িতে একজন পুত্র সন্তানের (সবুজ) জন্ম দিয়েছেন। তাই তিনি রকিব ভাইকে তাড়াতাড়ি মিছিল ত্যাগ করে হলে ফিরে যাবার জন্য তাগাদা দেন।

এই ভাষাসৈনিকের অসাধারণ ঐতিহাসিক বিবরণ ক্যানবেরা বেতারে তার সাক্ষাৎকারে পাওয়া যায়। শুনুন ৭:২০
মিনিটে https://banglaradio.org.au/sites/default/files/program_audio/2010/22Feb10.mp3?uuid=60d59c81b369f (ইঞ্জিনিয়ার জনাব এহসানউল্লাহর সৌজন্যে